Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-XIII, Issue-IV, July 2025, Page No. 49-57
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi, Assam, India
Website: http://www.thecho.in
DOI: 10.64031/pratidhwanitheecho.vol.13.issue.04W.007

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে প্রান্তিক নারী চরিত্র: প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের স্বর

আজিমুল হক, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, বনগাঁ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 18.07.2025; Accepted: 23.07.2025; Available online: 31.07.2025
©2025 The Author(s). Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Sribhumi. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Peasant movements are an important theme in Bengali novels after Independence. From Mahasweta Devi, Debesh Roy, Jharjeshwar Chattopadhyay to Soharab Hossain – each of them has portrayed different kinds of peasant movements in their novels. From the Tebhaga movement to the Naxalite movement and the recent Singur-Nandigram movement – all have emerged as subjects in their novels. Mahasweta Devi wrote in protest against the land acquisition policy affecting the Adivasis, Debesh Roy wrote highlighting the history of deprivation of the farmers of North Bengal, Jharjeshwar Chattopadhyay wrote about the Tebhaga struggle of Kakdwip, and Soharab Hossain wrote about the agricultural policies of the Left Front government and the recent Singur-Nandigram movements. The protesting characters in each of these novels are not only men, but women as well. How women, as rebellious figures, have leapt into the fight against landlords, zamindars, and exploiters to claim their rights and to free themselves from the curse of deprivation – these issues will be discussed in this essay.

Keywords: Bengali literature, Female farmer activists, Rural women, Agrarian movement, Women's empowerment, social change, Bengali novels, Rural feminism

স্বাধীনতা প্রাপ্তির এতবছর পরেও যে ভারতবর্ষের কৃষি সংকট কমেনি; বরং খাজনা নির্দিষ্টকরণ, জমিদারি বিলোপ, জমির সর্বোচ্চ সীমা বেঁধে দেওয়া, উদবৃত্ত জমি ভূমিহীন ও দরিদ্র কৃষকের মধ্যে বন্টন ইত্যাদি সমাজ উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা কৃষিকে পুনরুজ্জীবিত করবার আইনি ব্যবস্থাগুলিও ভারতের কৃষি-কাঠামোর মৌলিক সংস্কার ঘটাতে পারেনি। আর সেজন্যই কৃষকের ভাগ্য বিশেষ পরিবর্তন হয়নি। সেই সংকট তীব্রতর হয়ে কৃষকের জমির জন্য ক্ষোভ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। বিশেষ করে সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসন্তোষ তীব্রতর হয়েছে। আর এই অসন্তোষ নিয়ে নারী প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে, বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। এ বিষয়ের আলোচনায় সর্বপ্রথম আলোচ্য মহাশ্বেতা দেবীর উপন্যাস। যাঁর লেখায় ভারতীয় সমাজের অন্যতম মুল দ্বন্দ্ব অর্থাৎ 'সামন্তবাদ বনাম কৃষকশ্রেণির দ্বন্দ্ব' যথাযথ প্রতিফলিত হয়েছে। ইতিহাস তাঁর অন্যতম প্রিয় বিষয়। ইতিহাসকে তিনি বারবার ব্যবহার করেছেন আখ্যানের পরিসরে— যে ইতিহাস বঞ্চনা, ক্ষোভ ও শোষিত কৃষকের কথা বলে। আসলে মহাশ্বেতা দেবী জীবনকে দেখেন ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে। মানুষকে দেখার পাশাপাশি কার্যত বনিয়াদ (structure) এবং উপরিতল (super structure) চিনতেও কোনো ফাঁক থাকে না। সময় ও সমাজের দলিলীকরণে বিশ্বাসী এই ঔপন্যাসিক তাঁর আখ্যানে যে বিশেষ সময়-সমাজের ভিতর-বাইরের পূর্ণাঙ্গ ছবি উপস্থাপিত করবেন সেটাই তো বলাই বাহুল্য। যেমন *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭)। মূলত ১৮৯৫-১৯০০ সাল পর্যন্ত সময়ের বাস্তবতাকে তিনি ধরতে চেয়েছেন। ছোটনাগপুর-সিংভুম-পালামৌ-রাঁচি এলাকার মুন্ডা জনজাতির জীবনসংগ্রাম, তাদের প্রতি আচরিত অত্যাচার–বঞ্চনা-শোষণের চিত্র ও তাদের প্রতিবাদ-প্রতিরোধকে গুরুত্বপূর্ণভাবে তুলে ধরেছেন *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসে।

সময়ের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে তুলে ধরার ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবী *অরণ্যের অধিকার* উপন্যাসের ভূমিকায় স্পষ্ট স্বীকারোক্তি করেছেন—

> "লেখক হিসেবে, সমকালীন সামাজিক মানুষ হিসেবে একজন বস্তুবাদী ঐতিহাসিকের সমস্ত দায়দায়িত্ব বহনে আমরা সর্বদাই অঙ্গীকারবদ্ধ। দায়িত্ব অস্বীকারের অপরাধ সমাজ কখোনই ক্ষমা করে না। আমার বীরসাকেন্দ্রীক উপন্যাস সে অঙ্গিকারের ফলশ্রুতি।"[১]

মহাশ্বেতা দেবীর *অরণ্যের অধিকার(১৯৭৭)* উপন্যাসের প্রেক্ষাপট ছোটনাগপুর-রাঁচি-পালামৌ এলাকায় মুন্ডা-সাঁওতাল-হো-ওঁরাও ইত্যাদি আদিবাসী মানুষের জঙ্গল হাসিল করা খুটকাট্টি গ্রাম। এই অরণ্যকে ঘিরেই তারা সুখে-শান্তিতে দিন কাটাচ্ছিল। ভূমি সন্তান মুন্ডারা চিরকাল শ্বাপদসঙ্কুল অরণ্য কেটে, বসতি পত্তন করে, ভূমি আবাদ করে, অরণ্যের সম্পদকে ব্যবহার করে বেঁচে ছিল। কিন্তু যে উৎপাদন ব্যবস্থার পরম্পরা তারা তৈরি করেছিল তা কেড়ে নিয়েছিল দিকু ভূস্বামী, মহাজন ও রাজারা। বিদেশি সরকার 'জংলা আইন' করে জঙ্গলের অধিকারও তাদের নিকট থেকে কেড়ে নিয়েছিল। খ্রিস্টান মিশনারিরা একটা পর্যায়ে মুন্ডাদের প্রতি সহানুভূতিশীল হলেও শেষ পর্যন্ত সম্মান রক্ষার লড়াইয়ে মুন্ডাদের পক্ষে থাকে না। আইন আদালত, উকিল, সরকারি অফিসার মুন্ডাদের ঠকায়। এরা সবাই প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শোষকের অংশ। একারণেই যখন অরণ্য লাঞ্ছিত, দিকুদের বিলাস ও মুনাফার উৎস পণ্যে পরিণত, যখন আইনের মারপ্যাঁচে বন্দী, যখন সামন্তবাদী শোষণ-শাসনে সন্তানহারা অশুচি তখনই মুন্ডারা রুখে দাঁড়ায়। কারণ মুন্ডাদের কাছে এই অরণ্য জমি মায়ের মতো। এই অরণ্য শুধুমাত্র আশ্রয়দাত্রী হয়ে ক্রোড় দেয় না, দেয় জীবনের বেঁচে থাকার গুরুত্বপূর্ণ রসদ, জীবিকার সন্ধান। আশ্রয়দাত্রী অরণ্যকে তারা জীবন রক্ষাকর্ত্রী ভাবে। উপন্যাসে দেখি—

> "তখন জঙ্গল, পাহাড়, জমি পড়েই থাকত, জায়গা খুঁজে খুঁজে এসে আচোটা জমিতে শাবল মেরে যে খুট গাড়ত, সেই খুটকাট্টি গ্রাম পত্তন করত।
> ওরা ছিল পুতি মুন্ডা। যেখানে গ্রাম পত্তন করত, সেখানে বসত করতে আসত মানুষ। আবার একদিন ওদের কেউ কেউ চলেও যেত নতুন জায়গায়। ওদের পায়ে পায়ে গড়ে উঠল তিলসা, তামার, উলিহাতু, চালকাড়— গ্রামের পর গ্রাম।"[২]

দীর্ঘদিন ধরে জমির লোভ অ-আদিবাসীদের নিয়ে আসে বিহারের সিংভূম অঞ্চলে ও রাঁচিতে। এদের অত্যাচারে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বীরসারা। ১৮৯৫-১৯০১ পর্যন্ত বিদ্রোহের আগুন জ্বলতে থাকে। ড. সুরেশ সিং এ-বিষয়ে লেখেন—

> "From about the second half of the eighteenth century tribal agrarian order in many parts of the Indian subcontinent disintegrated under the pressure of the influx of "aliens", land hungry peasantry from adjoining regions, "keen-eyed" traders and merchants. The movement of non-tribal population into tribal regions was accelerated by the establishment and consolidation of Britis adminsitration in these areas. The tribals reacted to those developments through a series of uprising in a bed of throw out the intruders from their homeland. On the social front the social consequences of agrarian breakdown and the advent of christianity shaped revitalisation movement blended and culminated in the last uprising by Mundas, the Ulgulan under the leadership of Birsa Munda in the Ranchi and northern part of Singhbhum district of Bihar."[৩]

এইভাবেই বহিরাগত দিকুরা বারবার অত্যাচারীরূপে মুন্ডাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। আর এই হাজারো বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে মুন্ডারা দিকুদের বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম করেছে তারই আখ্যান *অরণ্যের অধিকার* (১৯৭৭)। ভগবান বীরসার প্রচারে মুন্ডারা আসল শত্রুকে চিহ্নিত করতে পেরেছে। অতঃপর বেঠবেগারী না দেবার পরিবর্তে লড়াইয়ের কথা ভেবেছে। জনজাগরণের এই নতুন অভিসন্দর্ভ শুধু পুরুষদের মধ্যেই ছিল না, নারীদের মধ্যেও ছিল। তারাও রাতের অন্ধকারে পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে বিপ্লবীদের কাছে অস্ত্র পৌঁছে দিয়েছে।

উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ নারী চরিত্র সালী পেটে ও কোমরে অস্ত্র নিয়ে, গর্ভবতী নারীর সেজে, তীর পৌঁছে দিয়েছে এক ডেরা থেকে অন্য ডেরায়। উপন্যাসে দেখি—

> "দিনে রাতে গ্রামে পুলিশ পাহারা। রাতের আঁধারে মেয়েরা 'বাইরে যেছি গো' বলে বেরিয়ে আসছিল তিনজন। 'হয়া গেছা গো' বলে ফিরে আসছিল দুজন। বাকি একজন কখনো বালিকা, কখনও যুবতী, কখনো বৃদ্ধা, সাদা কাপড় খুলে বিবস্ত্র হয়ে কালো শরীর আঁধারের কালোয় সমর্পণ করে জঙ্গলে এসে খাবার ও জল রেখে চলে যাচ্ছিল।"[৪]

আসলে তাদের ভূমির কোল থেকে, জঙ্গলের আশ্রয় থেকে, আরণ্যক রসদ থেকে বঞ্চিত করা হলে মেয়েরাও ঘরে বসে থাকেনি। কেননা এই অরণ্য যেন তাদের কাছে কেঁদে কেঁদে জানাল দিকুরা তাদের অশুচি করেছে। তাই সন্তান হয়ে তাদের উপর দায় বর্তায় অরণ্যকে শুদ্ধ করার।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের *স্বজনভূমি* তেভাগা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ দলিল। আখ্যানের মূল চরিত্র অতুল কামিল্যা বা কামিল্যাবাবু বা মেকার। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে তার স্মৃতিতে উঠে এসেছে পুরোনো দিনের আন্দোলনের কথা। তার স্মৃতিতে উঠে এসেছে সেইসব দিনগুলো যখন সরকার গজেন মালির মাথার দাম দশ হাজার টাকা ঘোষণা করেছিল। কিন্তু একক মানুষের থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠে এসেছে কাকদ্বীপের জনসাধারণের আন্দোলন। ফসলের তিন ভাগের দু-ভাগের দাবিতে জোতদার-লাটদারদের বিরুদ্ধে চাষিরা যখন আন্দোলনে নেমে পড়ে। সারাদিন লুকিয়ে কাটানো, পুলিশের টহল, লাটদার নায়েবের মাইনে করা গুপ্তচর, নামে নামে আইডেনটিটি কার্ড, কার্ড নেই মানে রাষ্ট্রদ্রোহী বহিরাগত, এই ছিল তখনকার জীবন। বাঘের মতো গায়ের জোর ছিল কমলাকান্ত ভুঁইয়ার। কাকদ্বীপ ষড়যন্ত্র মামলায় জেল খাটতে গিয়েছিল। কমলাকান্তের স্মৃতিতে বেঁচে আছে যোগিন্দ্র দাস ও অহল্যা। স্বাধীন দেশের পুলিশ যাকে গুলি করে মেরেছিল সেই অহল্যার ছেলে রতিকান্তকে এসব গল্প শোনায় মামা কমলাকান্ত। সম্পর্কের চেয়েও নোনামাটির অনিশ্চিত জীবনে বড় হয়ে ওঠে ক্ষুন্নিবৃত্তি। এখানেই একদিন গর্ভবতী অবস্থায় কৃষকবধূ অহল্যাকে গুলি করে মারা হয়েছিল। তার পেট ফেটে রক্ত ঝরেছিল। ফলে এমন পরিস্থিতিতে লাটদার-চাকদাররা ভয়ে থরথর করে কেঁপেছে। এই চন্দনপিঁড়িতে 'অহল্যা'র মৃত্যু নিয়ে সলিল চৌধুরীর অনবদ্য দীর্ঘ কবিতা শপথ—

> "পাষাণী অহল্যা ওগো সেই রাজপথে / কান পেতে কি আমার আগমনী শোন! আমিও কান পাতি / আঘাতবিদীর্ণ সিক্ত শক্ত ক্ষতমুখে - / কোথায় সমুদ্র গর্জে তরঙ্গে উত্তাল / কোথায় কোরিয়া আর অন্ধ্র কাকদ্বীপ রক্তে আঁকা মানচিত্র নব পৃথিবীর।"[৫]

এছাড়াও বিনয় রায়ের কথা ও সুরে, বিখ্যাত গানে পাই অহল্যার কথা—

আর কত কাল, বল কতকাল

> "সইব এ মৃত্যু অপমান— এ আর সহে না
> *** *** *** *** ***
> কমলাপুরে শহীদ ডাকে— আয় রে, আয় আয় রে
> ডোঙ্গাজোড়ার শহীদ সুরেন— তোদের পানে চায় রে, চায় রে
> চন্দনপিঁড়ির সরোজিনী, অহল্যা মা
> তাদের খুনের তর্পণ হোল না— এ আর সহে না।
> *** *** *** *** ***
> অহল্যা মা, তোমার সন্তান জন্ম নিল না
> ঘরে ঘরে সেই সন্তানের প্রসব যন্ত্রণা
> শত কংস ধ্বংস করে, যে শিশু জন্মিবে
> মাঠে মাঠে তারই জল্পনা।"[৬]

সম্পর্কের চেয়েও নোনামাটির অনিশ্চিত জীবনে বড় হয়ে ওঠে ক্ষুন্নিবৃত্তি। এই কাকদ্বীপ চন্দনপিড়ি-র তেভাগা আন্দোলনেই একদিন গর্ভবতী অবস্থায় অহল্যাকে গুলি করে মারা হয়েছিল। তেভাগা আন্দোলনে বিদ্রোহী শক্তিরূপে নারীর ভূমিকা ছিল এরকম—

নিঃসন্দেহে তেভাগা আন্দোলনে সবথেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রমজীবী নারী চেতনার জাগরণ ও নারী শক্তির মুক্তি। বাংলা তথা ভারতের গণ আন্দোলনের ইতিহাসে শ্রমজীবী নারীসমাজের এত ব্যাপক অংশগ্রহণ ও আত্মত্যাগ অন্য কোনো গণ আন্দোলেনে ঘটেনি। গ্রাম-বাংলার কৃষক রমণী হাজার বছরের অপমান, লাঞ্ছনা, অত্যাচার, অবিচার ও কালিমার পঙ্ক থেকে এই আন্দোলনে উঠে এলো মহাশক্তিময়ী রূপ নিয়ে। তেভাগা কৃষক আন্দোলনে এদের তুলনাহীন সাহসিকতা দীপ্ত আদর্শবোধ, সংঘবদ্ধ প্রতিবাদের ক্ষমতা ও উন্নততর সাংস্কৃতিক চেতনা নতুন দীপ্তিতে ইতিহাসে ভাস্বর হয়ে আছে। এর পশ্চাতে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে পরিচালিত 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'-র একটি ভূমিকা রয়েছে। শহরাঞ্চলে কমিউনিস্ট নারী সংগঠনের কাজ ১৯৩০-এর দশকের শেষ থেকেই কিছু কিছু শুরু হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন 'জনযুদ্ধে'র পর্যায়ে, মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির নামে তখন সারা বাংলার বিভিন্ন মফঃস্বল শহরে এবং বৃহৎ নগরগুলিতে নারী সমাজকে সংগঠিত করার পরিকল্পিত উদ্যোগ শুরু হয়েছিল। বিশেষ করে ১৯৪৩-এ মন্বন্তরের সময় এই সংগঠনের কাজ বিশেষ প্রশংসা ও দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। সেই সময় থেকেই বাংলার গ্রামাঞ্চলেও কৃষক-রমণীদের সংঘবদ্ধ করা, তাদের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চার করার কাজ কমিউনিস্ট পার্টির নারী-সংগঠনের নেতৃত্বে দ্রুত অগ্রসর হয়। ইতিপূর্বে ১৯৩৭-৩৮ সাল থেকেই কৃষক সভার নেতৃত্বে বাংলার গ্রামাঞ্চলে কৃষক সংগঠনের বিস্তার ঘটলেও তা ছিল প্রধানত পুরুষকেন্দ্রীক। কৃষক রমণীদের সংগঠিত করার প্রচেষ্টা তাতে ছিল না। কার্যত তেভাগা আন্দোলনের সময়ই কৃষক মেয়েদের মধ্যে মহিলা সমিতি বা সংগ্রামী শ্রমজীবী নারী সংগঠন গড়ে ওঠে এবং তা দ্রুত বাংলার তেভাগা আন্দোলন অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণত কৃষক সমাজের ওপর যে পর্বত সমান সামাজিক সংস্কার ও অর্থনৈতিক শোষণের ভার চাপান থাকে তদপেক্ষা অধিক শোষণ, নিপীড়ন, অবিচার ও সংস্কারের বোঝা সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পারিবারিক ক্ষেত্রে বইতে হয় কৃষক মেয়েদের। একদিকে শ্রেণী-বৈষম্য জনিত নির্যাতন এবং সর্বোপরি জীবন ও জীবিকার নানা ক্ষেত্রে সামাজিক দলন, এই ত্রিমুখী আক্রমণের সম্মুখীন হতে হয় কৃষক রমণীদের। এতটা দুর্ভাগ্যের শিকার কৃষক পুরুষদের হওয়ার সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। সহস্র বছরের নানাবিধ ধ্যান ধারণা, কুসংস্কার বা পরিবর্তন বিরোধী চিন্তাচেতনা গ্রামাঞ্চলের কৃষক মেয়েদের উপর বিশাল এক বোঝার মতন চাপান থাকে— যার থেকে মুক্তি পাওয়া সহজ বিষয় নয়। ফলে এই যুগ যুগ লাঞ্ছিত কৃষক মেয়েরা যখন নানা ভাবে (রাষ্ট্রিক, সামাজিক, পারিবারিক) সর্বস্ব পণ করে সংগ্রামে নামে, তখন বোঝা যায় যে অবগুণ্ঠিত ও অন্ধকারাচ্ছন্ন গ্রামাঞ্চলে কৃষক সমাজের মূল স্তম্ভটি গড়ে উঠেছে আর এই সংগ্রামের প্রতিক্রিয়া হবে গভীর ও সুদূর প্রসারী। গ্রামীণ সমাজজীবনের মূল জীবনধারাকেই বদলে দেবে এই নারী জাগরণ।[৭]

অহল্যা আসলে এরকম চেতনার প্রতীক হয়ে উঠে এসেছে *স্বজনভূমি* উপন্যাসে। অহল্যার পাশাপাশি দেখি সরোজিনীর কথা— যে সংগ্রামী ভাইয়ের মুখে শেষ জলটুকু দিতে গেলে রাইফেলের ডগায় লাগানো ছুরির ফলায় এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায় যার পেট। অতুল কামিল্যার কন্যা ও বিশু কামিল্যার বোন পারুল স্বামীর ঘর ছেড়ে বাবার ভিটেয় ফিরে আসতে বাধ্য হয়, কারণ তার স্বামী নীলু বৌদি, কনকার সঙ্গে অবৈধ সম্পর্কে লিপ্ত। নিজেকে হীন, অপ্রয়োজনীয় অবহেলার পাত্র মনে হত পারুলের। অহল্যা, সরোজিনীর দেশে তারা নতুন যুগের মেয়ে।

দেবেশ রায়ের *তিস্তাপারের বৃত্তান্ত* গ্রামজীবন এবং রাজনীতির ভাগ-বাটোয়ারা নিয়ে একটি অনবদ্য উপন্যাস। পটভূমি উত্তরবঙ্গ। সেটলমেন্ট অফিসের অধস্তন কর্মী প্রিয়নাথ, যার পিঠে ঝোলানো সাইনবোর্ড 'হলফা ক্যাম্প', তাকে অনুসরণ করে আমরা উপন্যাস পড়তে শুরু করি। উপন্যাস শুরুও হয় একটি হাটের বর্ণনা দিয়ে। এই হাটে উপস্থিত অজস্র গ্রামীণ ও আরণ্যক জীবনের সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন পেশার মানুষ— ব্যাপারী, চাষি, মজুর, উদ্বাস্তু, জোতদার। এরা কেউ রাজবংশী, কেউ মদেশিয়, কেউ ভাটিয়া বলে পরিচিত। প্রিয়নাথের সুবাদে পরিচিত হই সেটেলমেন্টের তরুণ অফিসার সুহাসের সঙ্গে— যে জমি জরিপ করতে এসেছে এখানে। তারপর হাজির হয় কৃষক সমিতির নেতা, এমএলএ বীরেন্দ্রনাথ রায়বর্মন এবং অবশ্যই এ জায়গার সবথেকে 'দুষ্টু লোক' গয়ানাথ জোতদার। এসবের মধ্যেই অকস্মাৎ উঠে আসে এই বৃত্তান্তের নায়ক বাঘারু, গয়ানাথ জোতদারের 'মানষি'। কিন্তু এই অপাংক্তেয় বাঘারুর একমাত্র দোসর জঙ্গলের সন্তান মাদারির মা। যে মা থাকে ফরেস্টের কিনারে, হাইওয়ের ধারে, পাতার তৈরি ঘরে। আর কোথাও তার বসবাসের জায়গা নেই। মাদারির মা কোথা থেকে এসেছে তা নিজেও জানে না। পাতা দিয়ে ঘর বানিয়ে কোনোরকমে সে বাসস্থান তৈরি করে। জঙ্গল থেকে পাতা কুড়িয়ে, ছোটোখাটো

জীবজন্তু মেরে তার দিন চলে। মাঝে মাঝে এক একজন পুরুষ আসে তার জীবনে। সন্তানসম্ভবা হলেই সে পুরুষেরা তাকে ফেলে চলে যায়। মাদারির মা আবারও অপেক্ষা করে আর এক পুরুষের জন্য, আর এক সন্তানের জন্য। তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনে জঙ্গল থেকে ট্রাকভর্তি করে লোক নিয়ে যাওয়া হলে সে ট্রাকে হাজির মাদারি ও মাদারির মা। কিন্তু মাদারি ও মাদারির মা বুঝতে পারে এই উন্নয়নে এই রাজনীতিতে তারা 'বহিরাগত'। মাঝে মাঝে অবাক হয়ে তাদের যেন 'ভালো লাগছিল' এই এত কিছুর মধ্যেও—

> এই এত লোক, এত ট্রাক, এত মিছিল এত আওয়াজ, এত কথা—এর তো কোনো মানে নেই তার কাছে। ...মিছিলের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্কই নেই। ফরেস্টের অজস্র লতাপাতা, গাছ, ঝোরা—এর সঙ্গে তার সম্পর্ক এমন সর্বাঙ্গীণ ও দৈনন্দিন যে সেই সম্পর্কের বাইরে তার পক্ষে আসা সম্ভবই নয়।
>
> মাদারির মায়ের কাছে এই এত মিছিল, এত মানুষজন, এত হৈ চৈ একদিক থেকে অর্থহীন হলেও সেই হাটখোলা থেকেই তার কেমন ভালো লাগছিল। ...এত মানুষের গলার এত কথা—তার ভালো লাগে।[৮]

জঙ্গল থেকে উচ্ছেদ হয়েও, নিজের বাসস্থান থেকে হারিয়ে গিয়েও মাদারির মা তিস্তা ব্যারেজের উদ্বোধনের দিনে ভিড়ের মধ্যে সে তার 'সন্তান'কে খুঁজতে থাকে অর্থাৎ তার হারিয়ে ফেলা উচ্ছেদ হওয়া জোত-জমি ও বাসস্থানকে। এর বাইরে তো সত্যিই তার কাছে মিটিং মিছিলের অন্য কোনো মানে নেই। একসময় মাদারির মা দেখতে পায় সে তার গাড়ি হারিয়ে ফেলেছে, ছেলে হারিয়ে ফেলেছে। তাকে অন্য গাড়িতে করে ফিরিয়ে দেওয়া হবে মাদারিহাটে। সেখানে পৌঁছেও 'হে-এ মাদারি, মাদারি গে, মাদারি' বলে ডাকতে থাকে। কিন্তু মাদারি ফেরে না—

> "মাদারির মায়ের কাছে এই সবই অবান্তর—এই জাতীয় সড়ক এই সড়ক দিয়ে প্রতিদিন যাতায়াত করা ভারতবর্ষ, ঐ নদী, ঐ ব্যারেজ, ঐ বন্যা। সে জাতীয় সড়কের পাশেই তার নিজের নদী, নিজের বৃক্ষ, নিজের পাথর দিয়ে নিজের শ্যাওড়াঝোরা তৈরি করে নিয়েছে। তার নিজের তৈরি শেষ মানুষটিও ছিল, আজ থেকে আর থাকল না বোধহয়।"[৯]

এদিকে তিস্তার ব্যারেজ বিশাল উন্নয়নের প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেখানে ঘরহারা জোত-জমি হারা মাদারি পৌঁছতে পারে না। এদিকে বাঘারুও উদ্বোধন মঞ্চের দিকে এগোতে থাকলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশই 'জুড়ে দেয়' মাদারি ও বাঘারুকে। ব্যারেজের কিনারায় দাঁড়িয়ে শুরু হয় দুজনের সংলাপ—

> "ঐইঠে জল বন্ধ রাখিছে?
> বান্ধি রাখিছে।'
> 'ক্যানং করি বান্ধে জল'
> 'না জানো'
> 'ঐইঠে শেষ? এই ব্যারেজখান?'
> 'না জানো'।
> এইঠে তিস্তা? তিস্তা নদী?'
> 'না জানো।"[১০]

ব্যারেজ এসে কী চিরচেনা তিস্তাকেও অচেনা করে দিল? যে জন্য তারা তাদের পুরনো বাসস্থান তিস্তাকেও চিনতে পারে না। আসলে উন্নয়নের নামে জমি থেকে বাঘারু, মাদারিদের এই উচ্ছেদ তারা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। সেজন্য তিস্তা থেকে তিস্তা ব্যারেজ থেকে তারা আবার ফিরে যায় আপলচাঁদ জঙ্গলের ভিতরে। তিস্তা ব্যারেজের উন্নয়নকে তারা প্রত্যাখ্যান করল সেখান থেকে বিদায় নিয়ে—

> "এখন সারারাত, সারাদিন ফরেস্টের পর ফরেস্ট, নদীর পর নদী, হাটের পর হাট পেরোতে-পেরোতে তাদের কত কথা হবে, তারা দুজন দুজনকে কত জানবে, তাদের কতবার ঘুম পাবে আর কতবার জাগরণ ঘটবে, তারা দুজন দুজনের পক্ষে কত অপরিহার্য হয়ে উঠবে।"[১১]

এই প্রত্যাখ্যানের পথ ধরে বাঘারু ও মাদারির মা হেঁটে চলেছে নতুন জমির খোঁজে।

তেভাগা থেকে অপারেশন বর্গা হয়ে নন্দীগ্রাম-সিঙ্গুরের কৃষি বনাম শিল্পের দ্বন্দ্ব পর্যন্ত কালান্তরের ব্যাপ্ত পটভূমিকায় এক কৃষক পরিবারের চার পুরুষ ধরে চলা ভূমি দখল ও ভূমি অধিকার রক্ষার সংগ্রাম মুখর কাহিনি সোহারাব হোসেনের *মাঠ জাদু জানে* উপন্যাস। এই কৃষক পরিবারটির প্রথম প্রজন্মের দুই প্রতিনিধি জামির আলি ও ছমিরোন। ১৯৪৬-৪৭ সালে তেভাগা আন্দোলনের সময় সন্দেশখালির ধুচনিখালিতে সেই কৃষক-আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিল। স্বাধীন দেশের পুলিশ আর জোতদারের গুণ্ডাবাহিনীর সঙ্গে সেই সময় তেভাগার দাবিতে অর্থাৎ এক ভাগ মালিকের বাকি দু'ভাগ চাষির, এই নিয়ে জোটবদ্ধ কৃষকদের রক্তারক্তি সংঘর্ষ চলছে। থোঁড়গর্ভ ধান ছুঁয়ে কৃষকরা লড়াইয়ের প্রতিজ্ঞা করেছিল, আর সেই লড়াইয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে এগিয়ে এসেছিল তাদের মা-বোনেরা। এই মা-বোনেদের মধ্যে জামিরের স্ত্রী ছমিরোন আবার ছিল অত্যন্ত তেজস্বী এক নারী, বন্দুক বাগানো নিষ্ঠুর হাতগুলোর দিকে সে নির্ভয়ে এগিয়ে গিয়েছিল ঝাঁটা নিয়ে।

সোহারাব হোসেনের মাঠ জাদু জানে উপন্যাসের জামিরের ছেলে আমির আলি এবং তার স্ত্রী আখেরাতুন এই কৃষক পরিবারের দ্বিতীয় প্রজন্ম। জোতদার বা সামন্ত-প্রভু এবং কংগ্রেসি প্রশাসনের মদতপুষ্ট প্রবল প্রতাপশালী নুরো মিঞার অনুগত ভাগচাষি আমির। আমিরেরও বুকের ভিতর খুব কষ্ট কারণ তার বাপ পারেনি একটুও জমি কিনতে, সেও পারলো না একটা দানা জমি কিনতে। দুই ছেলে কওছার ও ছাত্তার যখন বর্গাদারের আইনি স্বত্ব চাইল, তখন তাদের শত্রু হয়ে গেল আমির। ক্ষমতার বিরুদ্ধে যাওয়ার মতো ঝুঁকি নেওয়ার সাহস ছিল না আমিরের। জোতদারের কাছে অপমানিত হয়েও সে জোতদারের বিরুদ্ধে যেতে পারল না, বরং দুই ছেলে তার চোখে শত্রু হয়ে উঠল। সোহারাব হোসেন খুব চমৎকারভাবে এক কৃষকের নতুন সময়কে বুঝতে পারার অক্ষমতা ও পুরোনো সময়কে অন্ধের মতো আঁকড়ে থাকার টানাপোড়েনের ছবি ফুটিয়ে তুলেছেন।

এই উপন্যাসে অন্যতম বিদ্রোহী চরিত্র সাবেরা। কৃষিজমির আন্দোলনে কিংবা ফসল রক্ষায় সাবেরা প্রথম সারিতে থেকেছে সব সময়। 'আসলে জমি ও মাঠের নামে মূর্ছা যায় সাবেরা। জমি ও ফসলের নামে উথলে উঠে তার বুকের সমস্ত সন্তোষ ও গভীরতা। মাঠের সঙ্গে ও মাটির সঙ্গে তার অদ্ভুত মিতালি সখ্যতা। ফলন্ত শস্যের দেশে সাবেরা উন্মত্ত হয়ে যায়। যখন কচি ধানগাছের হৃদয় ফুঁড়ে থোঁড় আসে- ধানের জন্ম হয়, তখন মাঝের দাঁড়ির মাঠের দু'বিঘের বন্দে বসে বসে ভোর রাতে আলো-আঁধারিতে সাবেরা পাগলের মতো ব্যবহার করে। গাছগুলোর গর্ভবতী বুকে চুমো খায়, আদর করে, হাত বুলিয়ে দেয়। কতদিন দেখেছে কওছার এ রকম সময় বউ তার ঘোর লাগা নেশাচ্ছন্নের মতন হয়ে যায়। মানুষ না, যেন কোনো আজব দেশের জীব মনে হয়। বড়ো অচেনা ঠেকে একান্ত আপন জনটিকে। নিজের বউ বলে মনে হয় না। মনে হয় আকাশের কোনো অতলান্ত থেকে নেমে এসেছে ধানপরি। সত্যিই পরির মতন রূপ সাবেরার। অন্তত কওছারের কাছে। বিশেষত তার নিজের হাড়-কালো খসখসে গতরের দেহটার তুলনায় সাবেরা সত্যিই পরি। ভাবতে বসলে মাথাটার মধ্যে তালগোল পাকিয়ে যায় কওছারের। তবুও না ভেবে পারে না। চাঁদজাগা রাতে এক আকাশ চাঁদের ছাটরা-ছর্‌রার মধ্যে ছাত্তারের সঙ্গে সংসার ভাগাভাগি হয়ে যাওয়ার পর, তার ভাগে-পড়া মাঝের দাঁড়ির এই দু'বিঘের বন্দে, সাবেরা পরি হয়ে যায়। খেতময় ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। জমির প্রতিটি ইঞ্চি যেমন কওছারের চেনা-জানা, তেমন সাবেরারও। প্রতিটি গাছের সঙ্গে, প্রতিটি ফসলের সঙ্গে, অপরূপ মিতালি সাবেরার।'[১১] এহেন সাবেরা কওছারকে জমির কথা বুঝিয়েছে। বুঝিয়েছে জমিই পুরুষের ধর্ম। জমি না থাকলে সে সাবেরাকেও দখল করতে পারবে না। সাবেরাই কওছারকে বিপ্লবী করে তুলেছে। উপন্যাসে দেখি—

> - তুমি না-বুঝ হোয়ো নাকো। পা'র তলায় মাটি রাখো। মাটি ফ্যালো।
>
> - ফেলতি তো চাই! কিন্তুক...! - কওছার দ্বিধামাখা গলায় জবাব দিয়েছিল - এর মধ্যি কোনো কিন্তুক রেখো না। ভাগে-ঠিকের চাষে অ্যাখন বরকত নিকো। ফের জমির ওপর তোমার দাবিও নিকো। তারও ওপর মালিকির খুশিতি তোমার দেহের বুনো মোষটা বাঁধা থাকপে আষ্টিপিষ্টি। চেরদিন।
>
> - কী বোললি? মোষ আবার বাঁধা থাকে নাকিন, বুনো মোষ?
>
> - থাকে তো! চরার মতন নিজস্ব জমি পালিও মোষ বাঁধা থাকে ঠিক -ঠিক।
>
> - তালি তুই সেই পুন্‌নো কথাই বোলতিছিস?

– হ্যাঁ বোলতিছি। যদি মরদ হও তা নিজির মালিকানায় জমি আনো। জমি চষো। ভাগরা করো।
– সেডা তো নেমকহারামিই করা হবে। হবে না?
– না হবে না।
– ক্যানো?
– চাষার জমি দখলে কখ্খনো নেমকহারামি হয় না।
– কিন্তু এডা তো অন্যায়। পাপ।
– আচ্ছা তোমার কথাই মানলুম। কিন্তুক রাত্রির চাঁদডারে কোনোদিন খেয়াল কোরে দেখোছো? ওডার গায়েও যে কিছু কলঙ্ক আছে তাও লেশ্চয়ই দেখোছো! হ্যাঁ কি না?
– হ্যাঁ দেখিছি।
– তালি? একটু-আধটু কলঙ্ক বুকি ধরেও য্যামন ওডা সোন্দর হয়, সেইরাম ছোটোখাটো দু-এট্টা পাপ বুকি লে বেঁচে থাকা চাষবাস মানুষ সোন্দর হয়। মন্দ হয়। বুইলে?
– বোলতিছিস?
– হ্যাঁ বোলতিছি। পষ্ট বোলতিছি ভাগরা-খাতায় নাম যদি লেখাও তেবে ব'লবো তুমি মরদ। নালি ভাবব শুধু দাঁড়াস সাপ।
– ধম্মে সবে তো?
– জমিতি লাঙল চাষই চাষার ধম্ম। জমিই চাষার বেহোস্তে-দোজক সপ। বুয়েছো?[১২]

ছমিরন, আখেরাতুন্নেসা (আমির আলির স্ত্রী) ও সাবেরাকে এক সারিতে দাঁড় করালে দেখা যাবে সাবেরাই স্বমহিমায় উজ্জ্বল এক অনন্য নারী চরিত্র। ছমিরন ও আখেরাতুন্নেসার মধ্যে যে মন-মেজাজের পরিচয় মেলে তা পরিচিত কৃষক-রমণীর রূপেরই মতো। কিন্তু দরিদ্র কৃষক-রমণীর অন্তরালে সঞ্চিত থাকে যে জ্বলন্ত সংগ্রামী শক্তি তারই বিস্ফোরণ ঘটেছে সাবেরার চরিত্রে। সাবেরা সংগ্রামী কৃষক-রমণী। জামির আলির লড়াকু শক্তির নারীরূপের প্রকাশ দেখেছি সাবেরার মধ্যে। লেখক সমধিক যত্ন সহকারে এঁকেছেন সাবেরার চরিত্র। তার স্বভাব-আচরণ, তার চিন্তা-ভাবনা ও ক্রিয়াকলাপের ঋজুতা ও দৃঢ়তার জন্যই সে কওছারের মতো পুরুষকেও ছাপিয়ে গিয়ে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে এক অনন্যসাধারণ নারী হিসেবে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল- কওছার যে সমস্যাকে মাথায় নিয়ে ব্যতিব্যস্ত হয়েছিল, নুরোমিঞার বন্দের আমগাছের আগ্রাসী ছায়ার সমস্যা, তার নিরসন হল শেষপর্যন্ত সাবেরার হাতে। নুরোমিঞার আমগাছগুলো সেই তো 'মাঠপরী' সেজে রাতের অন্ধকারে কেটে দিল। তার এই সমূহ ক্রিয়াকলাপের মধ্যেই ফুটে উঠেছে সাবেরার স্বরূপ। আবার এ-হেন সাবেরা জামির আলির সঙ্গে যৌন সঙ্গমের দৃশ্যে হয়ে উঠেছে সম্পূর্ণ এক জাদু-নারী। ভয়, লজ্জা, সংকোচ ও পাপের বিচারের কোনো তোয়াক্কা না করে, সাবেরা যেভাবে জামির আলির বীজ নিজের গর্ভে টেনে নিল তার মধ্যে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য কোনো চরম উন্মার্গধর্মিতা প্রবলভাবে কাজ করেনি, বরং তার মধ্যে রয়েছে পরিষ্কার সঠিক একটি হিসাব- তেজী সন্তান চাই তার ফসল রক্ষার জন্য। তা কেবল জামির আলিই পারে তাকে দিতে। এ পর্যায়ে সাবেরা তো শুধু কওছারের স্ত্রী নয়। সে এখন সংগ্রামী সন্তানের জননী।

বসিরহাটের সাংবেড়িয়া গ্রামের ভাগচাষি জামির আলির নাতি কওছার যখন লক্ষ করে মাঝেরদাঁড়ি মাঠে তাদের পটলখেতে পটল আর তেমন ভালো হচ্ছে না কারণ পটল খেতের অনেকাংশ গ্রাস করেছে বড়োচাষি নুরোমিঞার আমগাছের ডালপালা, তখনই সে বিদ্রোহ ঘোষণা করার ডাক দেয়। পটল ভালো না ফললে চাষের ক্ষতি। কওছার দেখে- গাছগুলো তার ভাতে টান দিয়েছে, রাতের ঘুম কেড়েছে, মনের শান্তি কেড়েছে, সুখের মহব্বত কেড়েছে, 'নেশা ধরানো বউ-এর কোল কেড়েছে।' সুতরাং এর বিহিত ব্যবস্থা চাই তার। কিছু বড় চাষির জন্য মার খাচ্ছে সাধারণ ভাগচাষি। সুতরাং 'জমি রক্ষার লড়াই হয়েছে, এবার দিতে হবে ফসল রক্ষার লড়াই।' এ নিয়ে কওছার মেম্বারের কাছে গেলে দেখতে পায় মেম্বার প্রধান অনেক পাল্টে গেছে। জমি রক্ষার আন্দোলনকে পাথেয় করে সে নির্বাচনে জয়লাভ করে ক্ষমতায় আসে। তার অবস্থার এখন আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সে এখন আপোষকামী সুবিধাবাদী নেতা। তার লক্ষ্য ছিল প্রধান হওয়া, মানুষের লড়াইকে প্রতিবাদে প্রতিকারে জারি রাখা নয়, সেই লক্ষ্য তার পূরণ হয়ে গেছে। আখের গোছানো হয়ে গেছে। তাই একসময় যে চাষির স্বার্থে জমি দখলের লড়াই করেছে

এখন সে সরে যাচ্ছে কওছারের মতো প্রান্তিক চাষির পাশ থেকে। নুরোমিঞার খেতের আমগাছের ছায়া মহারাক্ষস হয়ে কওছারের খেত গিলে ফেললেও মেম্বার প্রধান কিছুই প্রতিবাদ-প্রতিকার করতে পারবে না এর। কারণ ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রশ্নে কে কোথায় কার খেতে কী রোপণ করবে, আমগাছ না পটল- তা কোনো নেতা বলে দিতে পারে না। কথা ঠিক! কিন্তু তাহলে ব্যক্তিস্বার্থের জন্যে কী সমষ্টির স্বার্থের জলাঞ্জলি যাবে? এই প্রশ্নের কোনও উত্তর নেই মেম্বারের কাছে। সুতরাং খুব বেশি কথা তার সঙ্গে কওছারের হতে পারে না। বিপক্ষ পার্টির এক আধা-নেতার মোটর সাইকেলের পিছনে চড়ে মেম্বার প্রধান ছুটল বসিরহাটে, কওছারের সব কথা না শুনেই। অবশ্য কওছারও ছাড়তে নারাজ। তার শিরা-ধমনীতে বইছে এককালের তেভাগা আন্দোলনের তুখোড় লড়াকু নেতা জামির আলির রক্ত, তার মনের মধ্যে ফুটছে নেশা ধরানো বউ সাবেরার মন্ত্র— 'জমি চাই, ভাগরা চাই'। এই সাবেরাই প্রথম কওছারকে জমি দখলের কথা বলে তার মধ্যে বিদ্রোহের আগুন জ্বালে—

> - তুমি না-বুঝ হোয়ো নাকো। পা'র তলায় মাটি রাখো। মাটি ফ্যালো।
> - ফেলতি তো চাই! কিন্তুক...!— কওছার দ্বিধামাখা গলায় জবাব দিয়েছিল।
> - এর মধ্যি কোনো কিন্তুক রেখো না। ভাগে-ঠিকের চাষে অ্যাখন বরকত নিকো। ফের জমির ওপর তোমার দাবিও নিকো। তারও ওপর মালিকের খুশিতি তোমার দেহর বুনো মোষটা বাঁধা তাহকপে আষ্টেপিষ্টি। চেরদিন।
> - কী বোললি? মোষ আবার বাঁধা থাকে নাকিন, বুনো মোষ?
> - থাকে তো! চরার মতো নিজস্ব জমি পালি ও মোষ বাঁধা থাকে ঠিক-ঠিক।
> - তালি তুই সেই পুন্নো কথাই বোলতিছিস?
> - হ্যাঁ বোলতিছি। যদি মরদ হও তা নিজের মালিকানায় জমি আনো। জমি চষো। ভাগরা করো।
> - সেডা তো নেমকহারামিই করা হবে। হবে না?
> - না হবে না।
> - ক্যানো?
> - চাষার জমি দখলে কখ্খোনো নেমকহারামি হয় না।
> - কিন্তু এটা তো অন্যায়। পাপ।
> - আচ্ছা তোমার কথাই মানলুম। কিন্তুক রাত্রির চাঁদডারে কোনোদিন খেয়াল করে দেখেছো? ওডার গায়েও যে কিছু কলঙ্ক আছে তাও লেশ্চয়ই দেখেছো! হ্যাঁ কি না?
> - হ্যাঁ দেখেছি।
> - তালি? এট্টু-আধটু কলঙ্ক বুকি ধরেও য্যামন ওডা সোন্দর হয়, সেইরম ছোটোখাটো দু'এট্টা পাপ বুকি লে বাঁচা থেকে চাষাবাসা মানুষ সোন্দর হয়। মদ্দ হয়। বুইলে?
> - বোলতিছিস?
> - হ্যাঁ বোলতিছি। বোলতিছি ভাগরা - খাতায় নাম যেদি লেখাও তবে ব'লবো তুমি মরদ। নালিভাবব শুধু দাঁড়াস সাপ।
> - ধম্মে সবে তো?
> - জমিতি লাঙল চাষই চাষার ধম্ম। জমিই চাষার বেহোস্তো-দোজক্ সপ।[১৩]

কওছার যেন নিজেকে পুনরায় আবিষ্কার করতে শুরু করল সাবেরার এই কথার মাধ্যমে। কওছার এর সমাধানসূত্র খুঁজতে গেছে মেম্বার প্রধানের বাড়ি। বিচিত্র চরিত্র এই সাবেরা যে কিনা ফুলশয্যার রাতেই স্বামীকে জানিয়ে দেয় যার কাছে জমি নেই তার নারীর উপর কোনও অধিকার থাকতে পারে না। এই আখ্যানে সাবেরা এমন এক নারী যাকে সমাজ ইতিহাস ছুঁয়ে যায় বারবার। আর পুরবাসিনী নয়, বরং জমিকে কেন্দ্র করে তার যাবতীয় সংসার সোহাগের স্বপ্ন, তাই সে শ্বশুরবাড়ি থেকে নিরুদ্দেশ হয়, কওছার আত্মনিয়ন্ত্রনের অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও শারীরিক ও মানসিক টানে শেষ অবধি সাবেরাকে ঘরে তুলল। বড়ো মেম্বার এমদাদুল আর ছোটো মেম্বার

যৌথভাবে কওছারের বিচিত্র পারিবারিক পরিস্থিতিকে কাজে লাগিয়ে ব্যাপক লড়াইয়ের মধ্যে দিয়ে মাঝেরদাঁড়ি গ্রামে বর্গা আন্দোলন পত্তন করে।

তথ্যসূত্র:

১. দেবী, মহাশ্বেতা। 'ভূমিকা', অরণ্যের অধিকার। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ: ৩।
২. দেবী, মহাশ্বেতা। অরণ্যের অধিকার। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, কার্তিক ১৩৮৬, পৃ: ১৩।
৩. Sing, Suresh. The Dust Storm And the Hanging Mist. Firma K. L. Mukhopadhay, Calcutta 1966, p.1.
৪. দেবী, মহাশ্বেতা। 'ভূমিকা', অরণ্যের অধিকার। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ভাদ্র ১৪২২, পৃ: ১৭২।
৫. চৌধুরী, সলিল। 'শপথ'। পরিচয়, আশ্বিন ১৩৫৭, পৃ: ৫১।
৬. রুদ্র, সুব্রত (সম্পাদিত)। গণসংগীত সংগ্রহ। নাথ ব্রাদার্স, নভেম্বর ১৯১৯০, কলকাতা-৭৩, পৃ: ১৫৪।
৭. রায়, সুপ্রকাশ। তেভাগা সংগ্রাম, 'তেভাগা সংগ্রামে নারী'। র‍্যাডিক্যাল, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৯, পৃ: ৫৪-৫৬।
৮. রায়, দেবেশ। তিস্তাপারের বৃত্তান্ত। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জুলাই ১৯৮৮, পৃ:. ৯১।
৯. তদেব, পৃ: ১৩৩।
১০. তদেব, পৃ: ২২২।
১১. তদেব, পৃ: ২৫৪।
১২. হোসেন, সোহারাব। মাঠ জাদু জানে। করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ২০১০ পৃ: ১৪০।
১৩. তদেব, পৃ: ৫৭।